টিনের পুতুল - স্মরণজিত চক্রবর্তী

সকালে ঘুম ভাঙতে আজ দেরি হয়ে গেল রিজিয়ার। ভোর রাতে এমন একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আচমকা। তারপর সেই স্বপ্নটাই ঘুরছিল মাথার মধ্যে। সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই আবার কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন খেয়াল নেই! তাই একটু বেলা হয়ে গেছে আজ। পাশের কাঠাল চাঁপা গাছ ছাড়িয়ে রোদটা ওই পেয়ারা গাছের ডালগুলো ছুঁয়ে দিয়েছে। এই ঘরটা বেশ বড়। উঁচু সিলিং। বড় বড় কাচের জানলা। সঙ্গে লাগোয়া বারান্দায় ঝরোকার কারুকাজ। দূরে গঙ্গা দেখা যায়। দেখা যায় তার সবুজ পাড় আর সেখানে পড়ে থাকা সকালো কামানটা। সেই সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করে বাংলাদেশ থেকে এসে ঢুকেছিলেন এই বাড়িতে। তারপর ছেষট্টি বছর হয়ে গেল! তবু আজও সব নতুন লাগে রিজিয়ার। ভিতরে ভিতরে সেই সতেরোর মনখারাপ আর ছটফটানি আজও টের পান খুব। ঘুম থেকে উঠেই শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটাকে প্রণাম করেন রিজিয়া। একটুখানি তাকিয়ে থাকেন, তারপর শুরু করেন দিন! আজ একটা বিশেষ দিন। বাড়িতে ছোটাছুটি চলছে। দোতলার এই ঘর থেকেই শুনতে পাচ্ছেন সব। ইস, ওঁরও তো কাজে লেগে পড়ার কথা। কিন্তু এমন একটা স্বপ্ন দেখলেন যে দিনটাই ঘেঁটে গেল যেন! কিন্তু কী স্বপ্ন দেখলেন ভোরবেলা? নদী দেখলেন কি? আবছা জ্যোত্স্না? কেউ কি দাঁড়িয়েছিল দূরে? নাঃ, স্পষ্ট হচ্ছে না! ঘষা কাচের ওপারেই যেন রয়ে যাচ্ছে সব! মনের বয়সটা বুঝতে না পারলেও শরীরের বয়সটা বেশ বুঝতে পারেন রিজিয়া। হাঁটতে কষ্ট হয়। হাঁপ ধরে যায়। মাঝেমাঝেই কেমন যেন ঘুরে যায় মাথা! বোঝেন শরীর এবার ছুটি চাইছে। ঘরের লাগোয়াই বাথরুম। স্রেশ হয়ে নীচে নামতে আরও মিনিট কুড়ি লেগে গেল ওঁর। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই দেখলেন নিতাই উঠে আসছে ওপরে। ওঁকে দেখে বলল, "মা, বাবু খুব রাগ করছে! সাড়ে সাতটা বেজে গেছে কিন্তু এখনও আপনি ওঠেননি শুনে চিত্কার করছেন খুব।" রিজিয়া জিজ্ঞেস করলেন, "নমিতা আসেনি?" "হঁ্যা নার্সদি তো এসেছে। কিন্তু তাও বাবু..." রিজিয়া জানেন লোকটা এমনই। নব্বই বছর বয়স হল। গোটা শরীরটা পড়ে গেল বিছানায় তবু মুখের জোর আর বদ মেজাজটা গেল না! "আমি যাচ্ছি, তুই যা।" "মা, ওই এস্টোর রুমটা পরিষ্কার করছি। ভাঙ্গারওলা আসবে পরে। সব দিয়ে দেব কি?" "আমায় দেখিয়ে তারপর দিবি।" রিজিয়া আর দাঁড়ালেন না। নমিতা মেয়েটা ভাল, সকাল সাতটার মধ্যে চলে আসে। যায় রাত ন'টা নাগাদ। তারপরের সময়টুকু নিতাই-ই সামলায় মুকুলকে। মুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিয়ের আগে নিজের বরের নামটাও শুনতে চাননি রিজিয়া। মাথা নিচু করে, ঠোঁট টিপে বসেছিলেন ঘরে। আর মা শাপশাপান্ত করে যাচ্ছিল ওঁকে! কত দিনের আগের কথা, কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে। মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা। মনে হয় আর একটু পরেই বাইরের উঠোনে বাবার খড়মের শব্দ শোনা যাবে। বিয়ের পিঁড়িতে বসে একবারও বরের দিকে তাকাননি রিজিয়া। মাথার ভিতর তখন আগুন পাক খাচ্ছিল। মালা বদলের সময় বাড়ির বড়রা জোর করে থুতনি তুলে ধরলেও চোখ বন্ধ করে নিয়েছিলেন উনি। এমনকী ফুলশয্যার রাতে যখন শরীরের ওপর চেপে বসেছিল ভারী শরীরটা তখনও তাকাননি রিজিয়া, তখনও চোখ বন্ধ রেখেছিলেন। মনে মনে ভেবেছিলেন দেখবেনই না কিছু। আর কাউকে যে দেখার থাকতে পারেই না এ জীবনে! এক্ষুনি ওই ঘরে যাবেন না রিজিয়া। আগে বাগানে যেতে হবে। সকালের ফুলটা এখনও নিজেই তোলেন। বাড়িতে চার পাঁচজন কাজের

www.MonerSathe.Com

লোক আছে। কিন্তু তবু এটা কারও ওপর ছাড়েন না। ছোট থেকেই ফুল তোলাটা খুব প্রিয় কাজ ওঁর। পিতলের সাজি নিয়ে ধীরে ধীরে ফুল তুললেন রিজিয়া। তারপর দাঁড়ালেন একটু। শীতকাল। একটা আবছা কুয়াশা জড়িয়ে আছে গাছে গাছে। সামনের রাস্তাটাও কেমন যেন ভেজা। দূরে গঙ্গার থেকে হাওয়া আসছে একটা। শালটা ভাল করে কানে জড়িয়ে নিলেন এবার। জল দেখলে আজও কেমন যেন ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে ওঁর। সোঙ্গরের সেই কিশোরীবেলার কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় ধলেশ্বরীকে। "মা, বাবু খুবই রাগারাগি করেছন!" এবার মালতী এল বলতে। রিজিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকালেন ওঁর দিকে। মেয়েটা রান্না করে। হাত বেশ ভাল। এ বাড়িতেই থাকে। বললেন, "দুধ মানকচুটা পেয়েছিস?" "হঁ্যা মা," মালতী ঘাড় নাড়ল, "আচ্ছা, দেবুদা এখনও এসব খায়?" রিজিয়া আবার গঙ্গার দিকে ফিরলেন। নদীটা কেমন যেন রোগা হয়ে এসেছে। সত্যি, না এটা মনের ভুল? দেবু চলে গেছে বহু বহুদিন আগে। প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেল! ওর বড় ছেলেটাকে দেখেছিলেন সে সময়। তারপর কত কী যে ঘটে গেল! রিজিয়া বললেন, "চল, ভিতরে চল।" "মা, বাবু আপনাকে খুঁজছিলেন।" ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াতেই নমিতা বলে উঠল। মুকুল নীচের ঘরে থাকেন। রাতে নিতাইও শোয় এই ঘরে। গত ন'বছর শয্যাশায়ী হয়ে আছেন মানুষটা। আর এখন তো একদম বিছানার সঙ্গে লেগে গেছেন। সব্বাই বলত মদ আর সিগারেটটা ছাড়তে। বলত এত বয়স হল এবার একটু সংযম দাবি করে শরীর। কিন্তু কারও কথা শুনতেন না মুকুল। দু'বার স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল। আর শেষে একটা সেরিব্রালে পুরো ফেলে দিয়েছে শরীরটা। রিজিয়া ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলেন মুকুল বিরক্ত মুখে তাকিয়ে রয়েছেন। "খুঁজছিলে?" "কী করছিলে তুমি? এই বয়সে এত ঘুম আসে কোথা থেকে?" "কী দরকার বলবে?" রিজিয়া শান্ত গলায় বললেন। "আমার ওষুধ কই? কে দেবে সেসব?" মুকুল খিঁচিয়ে উঠলেন। "নমিতা দেয়নি?" "সব নমিতা করবে? তোমার কর্তব্য নেই! সারা জীবন তো ফাঁকি দিলে শুধু।" "মনে নেই তোমার আজ দেবু আসবে?" রিজিয়ার কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না! মুকুল বললেন, "দেবু কোন লাটের বাট যে তার জন্য আমার ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হবে! জানি জানি, সব জানি। যদি সেই সাহেব থাকত তবে কি আর এমন অবহেলা করতে তুমি!" ক দূর থেকে জমিদার বাড়িটাকে কেল্লার মতো লাগে রিজিয়ার। দোতলার বড় বারান্দাটা দেখা যায়। জমিদারমশাই দুপুরবেলা ছড়ানো ডেক চেয়ারটায় লম্বা হয়ে শুয়ে তামাক খান। আর ধলেশ্বরী দিয়ে কোনও নৌকো গেলেই পাইক দিয়ে থামান সেটাকে। যারাই নদী দিয়ে যায় তারা দুপুরে জমিদার বাড়িতে না খেয়ে যেতে পারে না! রিজিয়ার হাসি পায়। সত্যি, টাকা থাকলে কত কী করে মানুষ! পুঁটির সঙ্গে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ে ঘুরতে আসে রিজিয়া। তবে গত সাত দিন আসতে পারেনি! জ্বর হয়েছিল। আজ এসে ভাল লাগছে। আকাশে মেঘ করে আছে খুব। ঘোর বর্ষা চলছে। ধলেশ্বরী থেকে থেকেই হাওয়া-লাগা পালের মতো ফুলে ফেঁপে উঠছে। রিজিয়া বলল, "হঁ্যারে পুঁটি, বাবাদের আসতে কি আজ দেরি হবে?" রিজিয়ার বাবা পুরোহিত। পুঁটির বাবার সঙ্গে জোট বেঁধে কাজ করেন। আজ একটা শ্রাদ্ধের কাজ আছে। তাই সকাল সকাল বেরিয়েছেন। পুঁটি বলল, "হবে হয়তো। কেন?" রিজিয়া জমিদার বাড়ির দিকে তাকাল, বলল, "যাবি ওখানে? সরমা এসেছে জানিস?" জমিদারের ছোট মেয়ে সরমা। গত বছর বিয়ে হয়েছিল। এখন বাপের বাড়ি এসেছে। বাচ্চা হবে। পুঁটি বলল, "না, যাব না। গেলেই খালি খোঁটা দেয়। বলে সতেরো বছর বয়স হল, বিয়ে হচ্ছে না কেন? পড়া-লেখা করে বিদ্যেধরী হব নাকি! ধুর, ভাল লাগে না আমার। যাওয়ার

www.MotherSathe.Com

হলে তুই যা।” রিজিয়া বলল, “সে তো আমাকেও বলে— ওমা তোর এমন নাম কেন! তাতে কি আমি রাগ করি! জেঠু রেখেছে তাই আমার নাম এমন। কে কী বলল তাতে কিচ্ছু এসে যায় না!” পুঁটি মুখ বেঁকাল, “ছাড় তো। তোকে কেন এখানে আনলাম জানিস?” “কেন?” রিজিয়া তাকাল পুঁটির দিকে। “ওই দেখ, সাহেব কুঠিতে নতুন লোক এসেছে।” পুঁটি হাত দিয়ে দেখাল। দূরে বড় বড় গাছের মাঝে খুব সুন্দর একটা বাড়ি আছে। তার চারিদিকে সাদা বেড়া দেওয়া, সামনে বাগান। কাছের হিলজার্স চটকলের অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার এই বাড়িতে এসে থাকে। রিজিয়া বলল, “তো? সব হুমদো হুমদো বুড়ো লাল-মুখোগুলো আসে। এ দেখার কী আছে?” পুঁটি হাসল, “আছে আছে, এবার যে এসেছে সে বুড়োও নয়, হুমদোও নয়। তাই তো দেখাতে আনলাম। কী সুন্দর দেখতে জানিস! বিকেলবেলা নদীর পাড়ের পাথরে বসে বেহালা বাজায়। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে বল খেলে। আর বাচ্চাদের কত রকমের লজেন দেয়!” “সাত দিনেই এত!” রিজিয়া ভুরু কোঁচকাল, “বউ বাচ্চা নেই?” “নারে, বাইশ-তেইশ বছর বয়স। চল না দেখবি।” “আঃ, আমি কেন দেখতে যাব? খেয়ে দেয়ে কাজ নেই আমার?” রিজিয়া বিরক্ত হল, “চল, বাড়ি চল। মেঘ করে আছে। বিষ্টি শুরু হলে মুশকিল। ভিজলে মা যা বকবে না!” পুঁটি আর কথা বাড়াল না। রিজিয়ার মেজাজ জানে ও। একবার ক্ষেপে গেলে রক্ষে নেই! সবাই বলে ভগবান যেমন রূপ দিয়েছেন তেমন তেজেরও ঘাটতি নেই! পুঁটি বোঝে এর বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। নদী পার থেকে বড় রাস্তা একটুখানি। সেখান থেকে রিজিয়াদের বাড়িটা হেঁটে মিনিট পাঁচেক লাগে। রাস্তায় উঠে শাড়ির কোঁচড় থেকে চালতা বের করল পুঁটি, “খাবি?” “নারে, ভাল লাগে না। মেয়ে বলেই কি টক খেতে হবে নাকি?” রিজিয়া কথাটা বলে সামনে তাকাল আর ঠিক তখনই দেখল তাকে। একটা সাইকেলকে হাঁটাতে হাঁটাতে নিয়ে আসছে সে। কমে আসা আলোর মধ্যেও কী উজ্জ্বল লাগছে! রিজিয়া নিজের অজান্তেই তাকিয়ে রইল! পাশের থেকে পুঁটি খোঁচা দিল, “ওই দেখ আসছে। এর কথাই বলেছিলাম। কী সুন্দর দেখতে, না?” আচমকা লজ্জা লাগল রিজিয়ার। চিরদিন ওকে দেখেই লোকে চোখ ফেরাতে পারেনি। আর আজ ও এমন করে তাকাচ্ছে! দ্রুত মাথা নামিয়ে নিল রিজিয়া। “কথা বলবি?” পুঁটি হাসল ঠোঁট টিপে। “মানে?” রিজিয়া ভুরু কুঁচকে তাকাল। “মানে আমি একদিন কথা বলেছি।
ইংরিজিতে। বলবি?” “কী বলল?” জিজ্ঞেস করল রিজিয়া। “বললাম, এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ।” “ধ্যাত্,” রিজিয়া ধাক্কা দিল পুঁটিকে, “এই তোর ইংরিজি!” পুঁটি হাসতে গিয়েও সচকিত হয়ে গেল। সাহেব একদম সামনে এসে পড়েছে। রিজিয়া ভাল করে তাকাল এবার। পাথর কেটে তৈরি করা মুখ। দেখল সাহেবও ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোজা। মাথা নামিয়ে নিল রিজিয়া। সারা গায়ে কদম ফুটল কেন! ও দেখল পুঁটিকে দেখে হাসল সাহেব। পুঁটিও হাসল, তারপর রিজিয়াকে দেখিয়ে বলল, “স্রেন্ড।” “বোনধু!” ভেঙে ভেঙে বলল সাহেব। তারপর রিজিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “মি রজার। ইউ?” রিজিয়া চোয়াল শক্ত করে মাটির দিকে মাথা নামিয়ে নিল। তারপর পুঁটির কবজিটা ধরে হনহন করে হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে। পুঁটি বাধা দিচ্ছিল, কিন্তু রিজিয়া শুনলই না। শুধু যেতে যেতে একবার আলতো করে পিছন দিকে তাকাল। আর দেখল মাঝপথে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রজার। ২ মুকুলের ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন রিজিয়া। মালতী রান্না শুরু করে দিয়েছে। খুদে বলে একটা ছেলে মালতীকে সাহায্য করে। ওঁকে দেখে মালতী বলল, “চাটনিটা আগে করে নিচ্ছি মা।

www.MotherSathe.com

তারপরে বাকিগুলো করব। আর নিতাইদা বলল মাছওলা আর একটু পরে মাছ দিয়ে যাবে। দু'রকম ছোট মাছই কি করব?" রিজিয়া মাথা নাড়লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "ছোট বউমা কি চলে গেছে?" মালতী তাছাড়া ষাটের ওপর বয়স হয়েছে। দেখ কতটা কী খেতে পারে!" মালতী কথা না বাড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। রিজিয়া পিছন থেকে ডাকলেন, "টিকুর খাবারটা করে দে তাড়াতাড়ি। নুডলস করে দিস। তেলটা কিন্তু কম দিবি। কেমন?" চায়ের কাপ হাতে মুকুলের ঘরের দিকে এগোলেন রিজিয়া। ওঃ, আবার খারাপ কথা শুনতে হবে! কিন্তু তার আগেই টিকু এসে দাঁড়াল সামনে। বলল, "আজ পড়তে বসব না ঠাম্মা। মা বকলে একটু ম্যানেজ করে নিও।" রিজিয়া বললেন, "একটু বোসো। দেখো তো পিকু কত ভাল রেজাল্ট করে আই.আই.টি-তে গেছে পড়তে। তুমি না পড়লে কি মান থাকবে?" পিকু কুশলের বড় ছেলে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে খড়গপুরে। ওরও আসার কথা আজ। তবে বলেছে সন্ধে হয়ে যাবে। দেবুর জন্য আবার কতদিন পর সবাই যে একসঙ্গে হবে! "প্লিজ প্লিজ ঠাম্মা," টিকু বলল, "একদিন না পড়লে কি আর আই.আই.টি মিস হয়? আর আমার ইচ্ছেও নেই ওসব। আমি হিস্ট্রি নিয়ে পড়ব। এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি অ্যান্ড রেলিক। তারপর ইন্ডিয়ানা জোনসের মতো অ্যাডভেঞ্চারে যাব।" "ঠিক আছে," রিজিয়া হাসলেন, "আমি দাদুকে চা-টা দিয়ে আসছি কেমন?" "আচ্ছা ঠাম্মা," টিকু রিজিয়ার শাড়ির আঁচলটা ধরে টানল, "সব তো বুঝলাম কিন্তু একটা জিনিস তো বুঝতে পারছি না!" "কী পারছিস না বুঝতে?" "এতদিন পর হঠাত্ জেঠু আসছে কেন গো? মানে এতদিন তো এল না। হঠাত্ এখন আসছে কেন?" রিজিয়া তাকিয়ে রইলেন টিকুর দিকে। ফর্সা মুখটায় জ্বলজ্বল করছে কৌতূহল। কিন্তু এর কী উত্তর দেবেন রিজিয়া! কারণ ও তো নিজেই জানেন না কেন হঠাত্ এত বছর পর ওর কাছে আসছে দেবু! খ রিজিয়ার মাঝে মাঝে মনে হয় কলকাতায় যদি যেতে পারত তবে পড়াশুনোটা আরও ভাল হত। এখানে পড়াশোনো করে ঠিক মন ভরে না। খুব কিছু বড় জায়গা তো নয় এই সোঙ্গর। ওদের ক্লাসে চারটে মাত্র মেয়ে পড়ে। তাতেই কত বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে হয়! দাদা গত মাসে কলকাতায় গিয়েছিল। কাছের একটা স্লাওয়ার মিলে কাজ করে দাদা। সেখান থেকেই শহরে পাঠিয়েছিল দাদাকে। দাদার থেকেই অনেক গল্প শুনেছে কলকাতার। হাতে আঁকা কয়েকটা ছবিও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে দাদা। শিয়ালদহ স্টেশন, মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া, হাওড়ার লোহার সাঁকো, ময়দান আরও কত কী যে জিনিস ছড়িয়ে আছে শহরটায়। দাদার মুখে গল্প শুনে এত লোভ হয় রিজিয়ার! মনে হয় ও যদি ছেলে হত! মেয়ে হওয়াটা পৃথিবীতে একটা অসুবিধে। যেন জন্ম থেকেই একটা হাত আর পা বেঁধে পাঠানো হয়েছে! এটা করবে না। ওদিকে তাকাবে না। ওটা খাবে না। ওর সঙ্গে কথা বলবে না। যাচ্ছেতাই কাণ্ড। তার ওপর আবার একটু বড় হতে না হতেই বিয়ে দিয়ে দেয় বাবা-মা! ভাগ্যিস জেঠামশাই বেঁচে ছিলেন তাই বাবা এখনও দুম করে ওর বিয়েটা দিতে পারেনি। নাহলে কি বাবা এতদিন অপেক্ষা করত নাকি? কত সম্বন্ধ যে ফি হপ্তায় আসে তার ঠিক নেই। লোকে বলে রিজিয়ার মতো সুন্দরী হয় না! সুন্দরী আর সুন্দরী! মেয়েদের এটা ছাড়া কি আর কিছু দেখতে নেই। শুধু চামড়ার দিকে লোভ! মাঝেমাঝে রিজিয়ার মনে হয় এই রূপটাই ওর শত্রু। মনে হয় নিজের মুখেই ক্ষুর চালিয়ে শত্রুটাকে শেষ করে দেয়! মা বলে, "এমন রূপ অবহেলা করিস না।" বলে, "দেখবি তোকে তোর বর কত ভালভাসবে!" দরকার নেই ভালবাসার! জেঠামশাইয়ের কথাই আসলে ঠিক। যে দেশে মেয়েরা সামনে এগিয়ে আসে না সে দেশের কিছু হয় না! জেঠামশাইকে বাবা ভয় পেত খুব। তাই

www.MotherSathe.com

রিজিয়ার বিয়ে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেনি। জেঠামশাইয়ের কথার ওপর কথা বলতে তো পারত না বাবা। কিন্তু এখন রিজিয়া বুঝতে পারে ওর সুখের দিন ফুরিয়ে আসছে। জেঠামশাই মারা গিয়েছেন গত বছর। এক বছর পার হয়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মা-ও ঠেলতে শুরু করেছে বাবাকে। বলছে, "সরমাটার বাচ্চা হয়ে যাবে আর তোমার মেয়ে ছাদনাতলায় পর্যন্ত গেল না এখনও!" এই অবস্থায় কলকাতায় গিয়ে পড়া যে রূপকথা সেটা বোঝে রিজিয়া। কিন্তু ব্যাপারটা ভাবলে যে ভাল লাগাটা তৈরি হয় সেটা হারাতে চায় না ও। আজ রবিবার, স্কুল ছুটি। ভরা বর্ষা চলছে এখন। চারিদিক জলে থৈ থৈ। ধলেশ্বরী ফুলে উঠে পাড় গিলে নিয়েছে অনেকটা। এ জলের তেজ খুব বেশি। সব ভাঙতে ভাঙতে যায়। সারা দিনের বৃষ্টির পরে এই বিকেলে রোদ উঠেছে একটু। আজ সরমার কাছে যাওয়ার কথা ওর। জমিদার গিন্নি খুব ভালবাসেন রিজিয়াকে। মায়ের কাছে প্রায়ই রিজিয়ার জন্য খাবার পাঠিয়ে দেন লোক দিয়ে। কিন্তু রিজিয়া কেন কে জানে একটু আড় হয়ে থাকে। অত বড়লোকদের সঙ্গে গা ঘেঁষতে ভাল লাগে না। সরমা নেহাত ওদের সঙ্গে পড়ত তাই বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। মা এইজন্য খুব বকে রিজিয়াকে। বলে জমিদার গিন্নি এত ভালবাসেন তাও কেন ওঁর কাছে যায় না রিজিয়া? বলে, "গিন্নিমা আমার কাছে দুঃখ করেন খুব। তুই যেদিন কাউকে ভালবাসবি সেদিন যন্ত্রণাটা বুঝবি, বুঝেছিস?" মা আজ নাড়ু করেছে। রিজিয়ার হাত দিয়ে পোর্সেলিনের এক বয়াম ভর্তি নাড়ু দিয়ে দিয়েছে সরমার জন্য। আর পুঁটি নিয়েছে মোরব্বা। দাদা কলকাতা থেকে একটা সুন্দর স্যান্ডেল কিনে এনেছে। আজ সেটাই পায়ে দিয়েছে রিজিয়া। পুঁটি বেশ কয়েকবার আড় চোখে চটিটা দেখেছে। আসলে এখানে রাবারের চটি ছাড়া ভাল কিছু পাওয়া যায় না। রিজিয়ার কষ্ট হয় পুঁটির জন্য। ওদের অবস্থা রিজিয়াদের চেয়েও খারাপ। দাদা আর বাবার মিলিত রোজগার ওদের তাও দিন চলে যায়। কিন্তু পুঁটির বাবার চার মেয়ে আর একটা ছোট ছেলে। একার রোজগারে ভদ্রলোকের নাভিশ্বাস ওঠে প্রায়! "কী চিন্তা করছিস তখন থেকে?" পুঁটি খোঁচাল রিজিয়াকে। "না, কিছু না।" রিজিয়া মাথা নাড়ল। সামনে রাস্তাটা গিয়ে নদীর পাড়ের বড় রাস্তায় মিশেছে। ওই অবধি পুরো রাস্তাটাই একদম মাখা সন্দেশের মতো হয়ে আছে। পুঁটি বলল, "আজ এই জুতোটা না পরলেই পারতিস। নষ্ট হয়ে যাবে।" রিজিয়া পাত্তা দিল না। ও নদীর দিকে তাকাল। বর্ষার জল-ভরা মেঘের তলা থেকে সূর্য ছিটকে বেরচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে নদীর জলে সোনার পাতা ভাসিয়ে দিয়েছে কেউ। ও জিজ্ঞেস করল, "সরমার কত মাস রে?" মাটির দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপছিল রিজিয়া। আবছা জলের ছাঁট এসে লাগছিল ওর মুখে।

"জানি না," বলেই পুঁটি চোখ বড় বড় করল, "জানিস আমার ছোট বোন কাল গিয়েছিল ওই রজার সাহেবের কাছে।" "একা? কেন?" চট করে তাকাল রিজিয়া। "একা নয়, ওরা কয়েকজন। কৌতূহল ছিল লোকটাকে নিয়ে। তাই লুকিয়ে দেখতে গিয়েছিল।" "কৌতূহল কেন?" রিজিয়া ভুরু কোঁচকাল, "এর আগে লাল-মুখো দেখেনি?" "নারে বাবা, এ লোকটা, আর লোকই বা বলছি কেন, ছেলেটা তেমন নয়। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বল খেলে। ঘুড়ি ওড়ায়। তাই বোনরা গিয়েছিল।" রিজিয়া কিছু না বলে তাকাল পুঁটির দিকে। পুঁটি উত্সাহিত হয়ে বলল, "সাহেব ওদের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কেক-রুটি খাইয়েছে। নিজে বানিয়েছে সাহেব। বোন আমার জন্য নিয়ে এসেছিল একটু। কী ভাল খেতে, জানিস! অবশ্য বাড়িতে কাউকে বলিনি।" রিজিয়ার বুকের ভিতরে কেমন যেন করে উঠল একটা। কেন করল কে জানে! কিন্তু বুকের

www.MotherSathe.Com

ভিতরটায় কী যেন মুচড়ে উঠল, কামড়ে উঠল! ও বলল, "ইস, এত হ্যাংলা তুই? দিল আর খেলি! ছিঃ।" পুঁটি আহত হল, বলল, "এমন করে বলছিস!" রিজিয়া আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই শব্দ শুনল একটা। ও দ্রুত বাঁদিকে ফিরে তাকাল। দেখল পাশের বড় কদম গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রজার। হাতে ছোট্ট একটা বাক্স মতো জিনিস। "কী হল এটা?" রিজিয়ার মাথা তো গরম ছিলই এবার আরও হয়ে উঠল। রজার হাসল, তারপর ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, "আমার ক্যামেরা। ছবি তুললাম একটা তোমার।" "ক্যামেরা?" রিজিয়া ভুরু খোঁচকাল। ও দেখেছে ক্যামেরা বলে জিনিসটা। জমিদার বাড়িতেই আছে। কিন্তু সে তো অনেক বড়! রজার হাসল, "হঁ্যা। আমার। এমন ওয়েদারে ছবি তুলতে বেরিয়েছি।" রিজিয়া চোয়াল শক্ত করে বলল, "এসব যন্ত্র দিয়ে আমার ছবি তুললেন কেন? কে বলেছে তুলতে?" রজার একটু থমকে গেল। আমতা আমতা করে বলল, "সরি। বুঝতে পারিনি।" রিজিয়া বলল, "জমিদার মশাইকে বললে না পিটিয়ে ছাতু করে দেবে। কেন তুললেন আমার ছবি? কেন?" রজার থমকাল একটু, তারপর অস্ফুটে বলল, "তুমি এত সুন্দর দেখতে তো... তাই কুডনট রেজিস্ট মাইসেলফ।" রিজিয়া তাকিয়ে রইল ওর দিকে। দেখল রজার মাথা নিচু করে চলে গেল। কিন্তু কী বলে গেল ও? এমন সরাসরিভাবে বলা যায়! বুকের ভিতর ধলেশ্বরী ফুলে উঠল যেন রিজিয়ার। শ্বাস কেমন যেন বন্ধ হয়ে এল! বুঝল নদী আবার পাড় ভাঙতে শুরু করেছে! পুঁটি বলল, "এ বাবা তোর ছবি তুলে নিল! এখন কী হবে? তোর বাবা জেনে গেলে?" রিজিয়া ওর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "আর তুই যে বাড়ির লোকদের লুকিয়ে কেক খেয়েছিস! সেটা কিছু নয়? সেটা জানলে? এখন চুপ করে চল তো!" ৩ "তুমি বারবার চলে যাচ্ছ কেন বলো তো? কী এমন রাজকার্য আছে তোমার? কে এমন আসছে?" মুকুলের দিকে তাকালেন রিজিয়া। সারা শরীর পড়ে গেছে। কথাও কিছুটা জড়ানো, তবু এখনও ভিতরের পশুটা মরল না! বাবা মা যে ঈশ্বর নয়, তা ছোট বয়সেই বুঝেছিলেন রিজিয়া। আর যত বড় হয়েছেন সেই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে ওঁর। এমন একটা মানুষের সঙ্গে কেউ বিয়ে দেয় নিজের মেয়ের? টাকা ছাড়া আর কী ছিল লোকটার? সবাই তো জানত কেমন ছেলে! গ্রামের মানুষদের ওপর অত্যাচারের নানা গল্প তো লোকের মুখে মুখে ঘুরত। তাই কলকাতায় পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শ্বশুরমশাই। তাও এই লোকটার সঙ্গে বাবা মা কী করে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিল ওঁর! বাবা মায়ের কথা ভাবলে মনটা তেতো হয়ে যায় রিজিয়ার। নিজেদের ঠুনকো সামাজিকতা আর সম্মানের জন্য মেয়েকে যারা বলি দিতে পারে তাদের সম্মান করবে কী করে! রিজিয়া বললেন, "বাড়িতে হাজারটা কাজ। কে দেখবে? তুমি এমন করছ কেন?" মুকুল দাঁত পিষে বললেন, "কেন, তোমার আদরের বউমাটি কোথায়? সে স্কুলে না গিয়ে একদিন বাড়ির কাজ দেখতে পারত না? আর তোমারই বা অত কী? কে এমন লাট সাহেব আসছে?" "দেবুর সঙ্গে তোমার কীসের এত শত্রুতা বলতে পার?" "শত্রুতা? বেজন্মা একটা। আমার সঙ্গে শত্রুতা কী করবে ও!" মুকুলের গলাটা থরথর করে উঠল। "তুমি... এখনও..." রিজিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। "নয়তো কী?" মুকুলের চোখে বিষ ঘনিয়ে এল যেন, "বিয়ের আগে আমি জানতাম না তোমার সঙ্গে ওই সাহেবটার আশনাই-এর কথা। কিন্তু বিয়ের পরে তো জেনেছি! তোমরা বড় ছেলের চোখ অমন কটা কেন? নোংরা একটা লোক। তোমায় ভোগ করে পালিয়ে গিয়েছিল। আর তুমি? আমায় ঠকাওনি?" রিজিয়া চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। এতগুলো বছর এই কথাটা এতবার শুনেছেন যে এখন আর কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না!

www.MotherBathe.Com

মুকুল আবার বললেন, “জানোয়ার সাহেব একটা। আমার জীবন শেষ করে দিল! তার সেই বেজন্মা সন্তান আসবে বলে কি আমায় নেত্য করতে হবে?” রিজিয়া কথা না বলে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। কিন্তু আজ একটু চিন্তা হচ্ছে। দেবুর সামনে এসব শুরু করলে আবার একটা ঝামেলা না হয়! কারণ দেবুর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণও তো এই কথাগুলোই! “মা, ভাঙ্গারওলা এসেছে।” নিতাই এসে দাঁড়াল সামনে। রিজিয়া বলেন, “তাড়াতাড়ি কর তোরা। দেবু আসবে যে কোনও সময়।” “আপনি একটু দেখবেন না মা? বললেন যে দেখবেন!” “ওজন-টোজন করুক। আমি আসছি।” আশি ছাড়িয়ে গেছে রিজিয়ার বয়স, কিন্তু এখনও যথেষ্ট কর্মক্ষম আছেন। শুধু আগে, যেমন বহুবার ওপর নীচে করতে পারতেন এখন আর তেমন পারেন না। সব কাজ সেরে একেবারে রাতে ওপরে যান। মাছ দিয়ে গেছে একটু আগে। মালতীকে দু’- একটা টুকটাক কথা বলে রিজিয়া আর দাঁড়ালেন না। কুশলকে এবার তুলতে হবে। গতকাল নিজেই বলল ঠাকুর বাড়ি থেকে প্রসাদটা নিয়ে আসবে। কিন্তু এখনও ঘুমোচ্ছে! রাতে ওইসব ছাই-পাশগুলো গিললে কি আর সকালে উঠতে পারে! কুশলের ঘরে গিয়ে একটু অবাক হলেন রিজিয়া। দেখলেন বিছানায় বসে খবর কাগজ দেখছে কুশল। মুখ দেখে বুঝলেন ব্রাশ-টাশ হয়ে গেছে। “উঠে পড়েছিস?” কুশল বলল, “না উঠে উপায় আছে? বাড়িতে যা হুড়ুম-দুরুম হচ্ছে!” “ঠাকুর বাড়ি যাবি না?” কুশল উত্তর দিল না! উটে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা মা, দাদার তো বড় ছেলে মারা গেছে না? ছোট ছেলেটার কী যেন নাম?” “পূরব। কেন রেয়” “না মনে হল। দেখিনি তো কোনওদিন। যা ছবি পাঠিয়েছিল তাও বোধহয় বছর পনেরো আগে। এখন তো অনেক বড় হয়ে গেছে না?” রিজিয়া চুপ করেই রইলেন। দেবুর বড় ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল বছর পাঁচেক আগে। তাকে ছোটবেলায় একবার দেখেছিলেন রিজিয়া। কিন্তু পূরবকে দেখেননি। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স হবে এখন। কেমন ছেলে কে জানে! কুশল বলল, “মা, বাবা বা তুমি কি কোনও উইল-ফুইল করছ নাকি?” “কেন? হঠাত্ এসব জিজ্ঞেস করছিস কেন তুই?” “না, দাদা হঠাত্ এত বছর পরে আসছে! আমাদের সঙ্গে তো যোগাযোগই রাখে না! কে জানে হয়তো টাকা পয়সার দরকার। এসে হয়তো এবার সম্পত্তি ভাগ করতে বলবে। ইউ নেভার নো।” “দেবু অমন ছেলে না, তুই ভাল করেই জানিস।” “সরি মা আমি জানি না,” কুশল উঠে পড়ল বিছানা থেকে, “যখন এ বাড়ি থেকে চলে গেছে তখন আই ওয়াজ সিক্সটিন। আমার চেয়ে কুড়ি বছরের বড় দাদা। দাদা না বলে কাকু বলা যায়। বাড়িতে যখন থাকত একাই থাকত। হয় বই পড়ত না হয় ক্যামেরা নিয়ে খুটখাট করত। কথা বলত কতটুকু? আমি জানব কেমন করে বলো তো! তবে যাই উইল-টুইল করো, একটা কথা মাথায় রেখো, দাদা কিন্তু তোমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আমি কিন্তু যাইনি। বুঝলে?” “তুই কী বলতে চাইছিস?” রিজিয়া সোজা তাকালেন কুশলের দিকে। কুশল হাসল, “এটা বুঝতে পারছ না? বাদ দাও। আমি ঠাকুর বাড়িটা ঘুরে আসি।” রিজিয়ার মনটাই তেতো হয়ে গেল। কোথায় একটা ছেলে এতদিন পরে বাড়ি আসছে, কিন্তু না ভাই, না বাবা, কেউ খুশি নয়। সবার এক প্রশ্ন, কেন আসছে দেবু? আরে, কেন আসবে না? রাগ কি সারা জীবন থাকে? মানুষ কি চিরকাল নিজের লোকদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারে? শাখা নদী কি এসে মূল শ্রোতে মিশতে চায় না? রিজিয়া ধীরে ধীরে উঠোন পেরিয়ে পিছনের দরজার কাছে গেলেন এবার। নিতাই বসে আছে। ভাঙ্গারওলাটি জিনিসপত্র গুছিয়ে এনেছে প্রায়। এই লোকটাই আসে ভাঙা পুরনো জিনিস কিনতে। নাম মুনির। একটা চোখ নষ্ট লোকটার। খুবই ভদ্র মানুষ। আজও মুনির রিজিয়াকে

www.MotherSathe.Com

দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে প্রণাম করল। বলল, "মা, সব গুছিয়ে নিয়েছি। শুধু এইটা..." কথা শেষ না করেই বস্তার আড়াল থেকে একটা কাপড় ঢাকা জিনিস বের করল মুনির। "কী এটা?" রিজিয়া জিজ্ঞেস করলেন। "জানি না মা। একটা বাক্স। দেখুন।" এবার নিতাই বলল, "স্টোর রুমের জিনিসের মধ্যে ছিল। পুরনো টিনের বাক্স।" কাপড়টা সরিয়ে মুনির এগিয়ে দিল বাক্সটা। আর সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে গেলেন রিজিয়া। এই বাক্সটা! এখনও আছে! টিনের চৌকো বাক্স। ঢাকনার ওপরে জঙে আবছা হয়ে আসা রং। রিজিয়া হাত বাড়িয়ে নিলেন বাক্সটা। তারপর চেপে ধরলেন বুকে। চোখ দু'টো জ্বালা করে উঠল হঠাত্। বুকের ভিতরে এতদিন পরে আবার যেন ফুলে উঠল বর্ষার ধলেশ্বরী! গ কাল শেষ রাত থেকে শুরু হয়ে এই বিকেল পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। গোটা গ্রামটাই কেমন যেন গোলা পায়রার পালকের মতো হয়ে আছে। দাদা আজ মিল-এ যেতে পারেনি। বাবাও জমিদার বাড়িতে পুজো করে এসে আর বেরোয়নি ঘর থেকে। চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে শুধু! ওদের বাড়িটা মাটি আর ইট মিশিয়ে তৈরি। মাথায় চালা। এমন বৃষ্টির দিনে সারা বাড়িটা সঁ্যাতসঁ্যাত করে। একবার কাঠের চৌকো ঘড়িটার দিকে তাকাল রিজিয়া। বুকের ভিতরটায় কেমন যেন করছে! দম আটকে আসছে। কষ্ট হচ্ছে। আর সত্যি বলতে কী ভয়ও করছে খুব। ও জানে একটু পরে যা হতে যাচ্ছে তাতে একদম পালটে যাবে ওর জীবন। সারাদিন আজ ঠিক মতো খেতেও পারেনি রিজিয়া। মা জিজ্ঞেস করেছে অনেকবার কিন্তু কী বলবে মাকে? কী করে বলবে? আয়নায় নিজেকে একবার দেখল ও। মনে মনে তৈরি করেছে নিজেকে। বাড়ির সবাইকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য বুকে পাথর রেখে আজ তৈরি করেছে নিজেকে। "রজার ওল্ডম্যান? ওল্ডম্যান? বুড়ো মানুষ?" নামটা শুনে খিকখিক করে হেসেছিল পুঁটি, বলেছিল, "রজার আর রিজিয়া। বেশ ভাল মিলেছে কিন্তু।" রিজিয়া হেসে নামিয়ে নিয়েছিল মুখ। ক'দিন দেখেছে ও রজারকে? কিন্তু তাতেই এত মায়া কী করে জন্মাল ছেলেটার ওপর? স্কুল থেকে ফেরার পথে এখন রজার দাঁড়িয়ে থাকে। চারটের সময় স্কুল ছুটি হয়। চটকল তো তখনও খোলাই থাকে, কিন্তু কী উপায়ে কে জানে রজার ঠিক চলে আসে। পথের পাশে ওর ওই বড় সাইকেলটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পথ দিয়ে হেঁটে আসা রিজিয়াকে একবার মাত্র দেখে। তাকায়। তাকিয়েই থাকে। তারপর ধীরে ধীরে চলে যায়। রিজিয়ার কেমন যেন গা শিরশির করে। ও তাকাতে পারে না ভাল করে। বুকের ভিতর একটা বেয়াড়া হরিণ লাফায় কেবল। পেটটা কেমন খালি খালি লাগে! মনে হয় সারাদিন এমন করে যদি ওর দিকে তাকিয়ে থাকত রজার! এমন চলতে চলতেই রথের দিন ঘটেছিল ঘটনাটা। স্কুল ছুটি ছিল সেদিন। পাশের গ্রামে বড় মেলা হয়। দাদা বলেছিল নিয়ে যাবে বিকেলে। কিন্তু দাদার এক বন্ধু এসে খবর দিয়েছিল যে ওভার টাইম পড়ে গেছে, দাদা আসতে পারবে না। খুব রাগ হয়েছিল রিজিয়ার। ও জেদ ধরেছিল একাই যাবে তবে। বাবা মা অনেক করে বোঝাবার পর একটু শান্ত হয়েছিল রিজিয়া। বলেছিল, "ঠিক আছে, তবে পুঁটি আর আমি যাব।" বাবা বলেছিল, দু'টো মেয়ে একা যাবি না। পুঁটির ভাইও যাবে তোদের সঙ্গে। নিধুকে আমি বলছি।" নিধু কাকা, মানে পুঁটির বাবা, আপত্তি করেনি। বাবার কথা খুব মেনে চলে নিধু কাকা। সেদিন রথের মেলায় খুব ঘুরেছিল ওরা। তবে কিনতে পারেনি বেশি কিছু। বাবা তো আর বেশি টাকা দিতে পারেনি! আপশোস হচ্ছিল রিজিয়ার। এত সুন্দর নীল কাচের চুড়ি দেখেছিল ওখানে! ঢাকার তৈরি জিনিস। কিন্তু দাম যা চাইল কিনতে পারল না! অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিল চুড়িগুলো। কিনতে না

www.MotherSathe.Com

পারায় মনটা খারাপ লাগছিল। ফেরার পথে আকাশ কালো করে এসেছিল একদম। ওরা পা চালিয়ে আসছিল সোঙ্গরের দিকে। কিন্তু বাড়ি থেকে আধ মাইলখানেক দূরে এত জোরে বৃষ্টি নামল যে আর এগোতে পারেনি! কাছেই রাধাবিনোদের একটা পরিত্যক্ত মন্দির আছে। মানে কাঠামোটা আছে, কিন্তু বিগ্রহ নেই। সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিল ওরা। পুঁটি তো ভয়ই পাচ্ছিল। কিন্তু কী করবে? এত বৃষ্টি পড়ছিল যে মনে হচ্ছিল সামনে কেউ দেওয়াল তুলে দিয়েছে। আর ঠিক সে সময়ই সাইকেলের ঘন্টির শব্দটা শুনেছিল ওরা। প্রবল বৃষ্টির শব্দের ফাঁক দিয়ে নরম শব্দটা ঠিক চিনতে পেরেছিল রিজিয়া। সঙ্গে সঙ্গে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল ওর। শ্বাস ভারী হয়ে এসেছিল। রিজিয়ার মনে হয়েছিল, ও যে আসবে সে তো জানতই! সাইকেলটা দাঁড়া করিয়ে মোটা ওয়াটার প্রুফে ঢাকা মানুষটা এগিয়ে এসেছিল ওদের দিকে। তারপর মাথার টুপিটা খুলে হেসেছিল। পুঁটি দ্রুত বুঝে নিয়েছিল ব্যাপারটা। ও ভাইকে নিয়ে সরে গিয়েছিল দূরের কোনায়। রিজিয়া ওদের বারণ করতে পারেনি! মাটির দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপছিল রিজিয়া। আবছা জলের ছাঁট এসে লাগছিল ওর মুখে। আর না তাকিয়েও বুঝতে পারছিল লম্বা মানুষটা এসে দাঁড়িয়েছে ওর কাছে। ওই সুন্দর গন্ধটা যে ও চোখ বন্ধ করে চিনতে পারে! রজার নরম গলায় বলেছিল, "তোমায় আজ দেখতে না পেয়ে মন খারাপ করছিল। মেলায় আচমকা দেখে ফেললাম। তাই..." ভাল লাগায় অবশ হয়ে গিয়েছিল রিজিয়া। ও কথা বলতে পারছিল না। মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না। কিন্তু তবু যেন সমস্তটা দিয়েই ও তাকিয়েছিল রজারের দিকে। "এটা তোমার জন্য।" রজার সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিল একটা কাগজে মোড়া জিনিস। রিজিয়া হাত বাড়ায়নি। একইভাবে দাঁড়িয়েছিল। রজার অপেক্ষা করেছিল সামান্য। তারপর একই রকম নরম গলায় বলেছিল, "আয়াম সরি। তুমি বোধহয় আমার আসাটা পছন্দ করছ না! আর ডিস্টার্ব করব না।" রজার পিছন ঘুরেছিল চলে যাবে বলে। আর পারেনি রিজিয়া। দ্রুত হাত বাড়িয়ে রজারের হাতের একটা পাতা চেপে ধরেছিল। থেমে গিয়েছিল রজার। তারপর ঘুরে তাকিয়েছিল। রিজিয়ার বড় বড় চোখের পাতায় যেন আটকে গিয়েছিল ওর চোখ। রিজিয়াও চোখ সরাতে পারছিল না। সেই গন্ধটা ক্রমশ ঘিরে ধরছিল ওকে। রজারও এগিয়ে আসছিল আস্তে আস্তে। পায়ে জোর পাচ্ছিল না রিজিয়া। শরীর ওর কথা শুনছিল না। রজার এসে দু'হাতে কোমরে জড়িয়ে ধরেছিল ওর। তারপর ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসেছিল ঠোঁট। বৃষ্টিটা কি বেড়েছিল আরও? দূরে রাঘব দিঘির পাশের জাম গাছে কি কড়কড় করে আছড়ে পড়েছিল বাজ? ছোট ছোট মাটির ঘরগুলো কি ঝুপ ঝুপ করে ভেঙে পড়ছিল সুদেশ মাঝির খালে? জানে না, রিজিয়া কিচ্ছু জানে না। ও শুধু রেনকোটের ভিতর দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে চেপে ধরেছিল রজারকে। আর নিজের সমস্ত ভালবাসা স্থাপন করছিল রজারের দুই ঠোঁটের মধ্যে। এক সময় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল রজার। এক ঝাঁক পায়রার মতো করে লজ্জা এসে ঢেকে ফেলেছিল রিজিয়াকে। রজার হাতের জিনিসটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, "এটা তোমার। দেখো।" ধীরে ধীরে কাগজ খুলেছিল রিজিয়া। দেখেছিল এক গোছা নীল কাচের চুরি! তারপর বেশ কয়েকবার লুকিয়ে দেখা করেছে ও রজারের সঙ্গে। পুঁটিই ওকে সময় আর সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু রিজিয়া জানে এমন করে তো চলতে পারে না। তাই গত দু'দিন আগে ও বলেছিল, "আমি এভাবে আর আসতে পারব না। লোকে যে কোনও দিন জেনে যাবে। আমায় মেরেই ফেলবে মা।" রজার তাকিয়েছিল ওর দিকে। কী বলবে বুঝতে পারছিল না। রিজিয়া বলেছিল, "দু'টো কাজ করা যেতে পারে। এক আমায় ভুলে যাও।

www.MotherSathe.Com

আর দুই আমায় নিয়ে পালিয়ে যাও।” “পালাব” রজার অবাক হয়েছিল, “ইলোপ? কেন? কেন এমনটা করব আমি? না, পালাব না।” “তবে ঠিক আছে, ভুলে যাও।” অভিমানে চোখে জল এসে গিয়েছিল রিজিয়ার, “আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।” রজার নিশ্চিত গলায় বলেছিল। “মানে?” রিজিয়া অবাক হয়ে তাকিয়েছিল রজারের দিকে। “মানে, আমি তোমায় বিয়ে করার কথা বলব তোমার বাবাকে।” “পাগল নাকি? বাবা মানবে ভেবেছ? আমরা কুলিন ব্রাহ্মণ। বাবা তিনবার জপ না করে জল স্পর্শ করে না। আর তুমি তাকে বলবে? মেরেই ফেলে দেবে তোমায়।” রিজিয়া তাকিয়েছিল ওর দিকে। “কেন এমন ভাবছ? তুমি দেখো, আমি যাব তোমার বাড়ি। জানি ওঁরা রাগ করবেন প্রথমে। কিন্তু আমি ঠিক রাজি করাব। লাভ ইজ ডিভাইন। তোমার বাবাও তো তোমার মাকে ভালবাসেন। উনি ঠিক বুঝবেন! লজিক দিয়ে বোঝাতে পারলে ঠিক বোঝে মানুষ।” “আর যদি না হয়, তবে? তবে আমায় নিয়ে চলে যাবে তো?” রিজিয়া রজারের হাত দু’টো ধরে তাকিয়েছিল ওর চোখের দিকে। রজার বলেছিল, “তুমি তো আমার রিজিয়া। অ্যান্ড নো বডি ক্যান চেঞ্জ দ্যাট।” আজও বৃষ্টির শব্দের ভিতর দিয়ে সাইকেলের ঘন্টিটা শুনতে পেল রিজিয়া। ওর হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল নিমেষে। ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে ও হাত জোড় করে বলল, “বাবাকে রাজি করিয়ে দাও ঠাকুর। আর কোনওদিন উত্তর না দিয়ে চোয়াল শক্ত করে বসেছিলেন রিজিয়া। মুকুল এসে ধাক্কা মেরে শুইয়ে দিয়েছিলেন রিজিয়াকে।
কিচ্ছু চাইব না তোমার থেকে। তিন সত্যি করে বলছি, কিচ্ছু চাইব না!” ৪ ঠাকুরের থেকে নিজের জন্য আর কিছু চাওয়ার নেই রিজিয়ার। ও জানে ঠাকুর হয়তো ব্যক্তিগত স্বার্থ-পূরণ পছন্দ করেন না! টিনের বাক্সটা নিয়ে রিজিয়া খুদেকে ডাকলেন। বললেন ওপরে ওঁর ঘরে রেখে দিতে। ঘড়িটা দেখলেন একবার। কুশল কি গেল প্রসাদ আনতে? এ সময়টা একটু খবরের কাগজ দেখেন রিজিয়া। কিন্তু আজ ভাল লাগছে না। মন বড় অশান্ত হয়ে আছে। দেবু আসছে এতদিন পরে কিন্তু কারওই যেন তাতে আনন্দ নেই! কেন সবাই এমন করছে! অন্যান্য দিনের চেয়ে মুকুল আজ বেশি অশান্তি লাগিয়েছে। নব্বই বছর বয়সেও মানুষ এমন করতে পারে! আজকাল অনেক কিছুই ভুল হয়ে যায় মুকুলের। তার মধ্যেও কী করে অত বছর আগের অশান্তিটা মনে রেখেছে! স্মৃতি নাকি নিখুঁত সত্য নয়। বরং সত্য আর আমাদের বিশ্বাসের মিশেল। মুকুলের মনের মধ্যে কেমন ছবি তৈরি করে রেখেছে স্মৃতি? রিজিয়া তো এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারেন সবটা। রবিবার ছিল সেদিন। দেবু তার কয়েকদিন আগেই এসেছিল ইংল্যান্ড থেকে। দুপুরে খাওয়ার পরে বসার ঘরেই কথা হচ্ছিল সবার। দেবুর বড় ছেলে বিক্রম তখন বছর পাঁচেকের। সে খেলা করছিল উঠোনে। দেবু রিজিয়াকে বলেছিল, “মা, আমার সঙ্গে এবার একবার চলো। কয়েক মাস থাকবে। তারপর আমি নিজে এসে দিয়ে যাব তোমায়!” রিজিয়া বলেছিলেন, “নারে দেবু, ওখানে আমার ভাল লাগবে না। পারব না ওখানে থাকতে।” “চলো না মা,” দেবু বাচ্চাদের মতো করে আবদার করেছিল। আর ঠিক সেই সময়েই ঘরে ঢুকেছিলেন মুকুল। কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, “কোথায় নিয়ে যাবি তোর মাকে?” দেবু বলেছিল, “লন্ডনে। আমি আবার দিয়েও যাব।” “কেন? কী করবে ও ওই দেশে গিয়ে?” ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন মুকুল। “না মানে... এমনি...” “ও-ও ওই দেশে যাবে?” মুকুল গলায় বিষ নিয়ে তাকিয়েছিলেন রিজিয়ার দিকে, “কেন যাবে ওই দেশে? তোমার ভাতারকে খুঁজতে। এত বয়স হল তাও রস যায়নি?” রিজিয়ার কান নিমেষে লাল হয়ে গিয়েছিল। দেবুর বউ নীপা বসে রয়েছে যে সামনে! রিজিয়া বলেছিলেন, “কী

www.MonerBathe.com

বলছ কী তুমি?" "কেন তোমার সেই ভাতার তো ওই দেশেই থাকে। এখন কি ছেলেকে নিয়ে গিয়ে বাপের সঙ্গে আলাপ করাবে?" "বাবা কী বলছ তুমি?" দেবু আর নিতে পারেনি। উঠে দাঁড়িয়েছিল। "ঠিক বলছি। মাকে নিয়ে যাবে! তেল বের করে দেব তোর।" "কেন এসব বলছ তুমি।" দেবু এগিয়ে গিয়েছিল মুকুলের দিকে। "তুই মারবি আমায়?" মুকুল আচমকা এগিয়ে এসে থাপ্পড় মেরেছিলেন দেবুকে। বলেছিলেন, "বেজন্মা একটা। লাথি মেরে বের করে দেব বাড়ি থেকে। বের হ, বের হয়ে যা তুই। আমার সংসার ভাঙতে এসেছিস?" তিরিশ বছর হয়ে গেছে। তবু আজও কথাগুলোর ভিতরের বিষ নষ্ট হয়নি। বিয়ের দশ মাসের মাথায় দেবু এসেছিল পৃথিবীতে। তার কটা চোখ দেখে তখনই ক্ষেপে গিয়েছিলন মুকুল। সেই সন্দেহের লাভা সারা জীবন শিরার মধ্যে বহন করেছেন মুকুল। আজও কি কোনও অনিষ্ট হবে? "মা, শিগগিরি আসুন। দেবুদাদা এসে গেছে।" নিতাইয়ের গলার শ্বরে ঘোর কাটল রিজিয়ার। সামান্য ঝুঁকে পড়েছে দেবু। মাথার চুলও পেকে গেছে বেশিরভাগ। কিন্তু গোলাপি গায়ের রং আর চোখের আলোটা এখনও কমেনি একটুও। দেবু এসে সোজা জড়িয়ে ধরল রিজিয়াকে। কী সুন্দর গায়ের গন্ধ! চোখ বুজে এল রিজিয়ার। যেন দেখতে পেলেন হাসপাতালের ছোট্ট বেবি কট থেকে নিয়ে দেবুকে নার্স তুলে দিচ্ছে ওঁর হাতে। অদ্ভুত গোলাপ জল আর মাখন মেশানো একটা গন্ধ যেন টের পেলেন এত বছর পরেও। রিজিয়া মাথায় হাত রাখলেন দেবুর। অভিমানী ছেলের তবে অভিমান ভাঙল! দেবু কাঁপছে! কাঁদছে কি? কেন? সেই ঝগড়ার দিনে মার খেয়ে পড়ে গিয়েছিল দেবু। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল রিজিয়ার দিকে। বলেছিল, "মা তুমি চলো আমার সঙ্গে। এই জঙ্গলে থাকতে হবে না তোমায়। চলো।" রিজিয়া যাননি। ছোট্ট কথায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যেতে পারবেন না একেবারেই। দেবু শুধু তাকিয়েছিল ওঁর দিকে। তারপর বউ আর ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। একবারও ফিরে তাকায়নি! সে আজ কাঁদছে! দেবু সোজা হয়ে দাঁড়াল এবার। নাকটা লাল হয়ে আছে। রিজিয়া হেসে চোখের জল মুছিয়ে দিলেন ছেলের। বললেন, "এই শিখেছিস ওই দেশে? এতদিন পরে এসে কান্নাকাটি!" দেবু হাসল। মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকা বহু বছরের পুরনো মূর্তির মতো লাগল সেই হাসি। বলল, "পূরবের বিয়ে ঠিক করেছি। তাই তোমায় বলতে এলাম মা।" রিজিয়া বলেন, "তাই? নীপা কই? আর পূরব?" "ওরা আসছে। নীপার বাড়ি থেকে গাড়ি পাঠিয়েছিল। ওদের বাড়ি ঘুরে এই এসে পড়ল বলে।" দেবু নিজেকে শ্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। "চল, ভিতরে চল।" রিজিয়া হাসলেন। কিন্তু দেবু এগোবার আগেই 'জেঠু' বলে টিকু এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। রিজিয়া অবাক হলেন। দেবুকে তো কোনওদিন দেখেইনি টিকু। তবে? দেবু টিকুকে জড়িয়ে ধরে অসহায়ের মতো তাকাল টিকুর দিকে। তারপর বলল, "তুমি টিকু? আমায় চিনলে কী করে?" টিকু দেবুর কোমরের কাছটা জড়িয়ে ধরে বলল, "বাবা বলেছে তো। বলেছে, 'দেখবি কী সুন্দর দেখতে আমার দাদাকে। দেখবি কত ভাল আমার দাদা। আমার মতো খারাপ লোক নয়। জানিস দাদা ছোটবেলায় আমায় অঙ্ক করাত মাঝে মাঝে। অত ভাল অঙ্ক আর কেউ করতে পারে না।' আমি তো তোমায় চিনি জেঠু। বাবার কাছে গল্প শুনে শুনে আমি তো তোমায় খুব ভাল জানি। জানি তোমার মতো লেগব্রেক শেন ওয়ার্নও করতে পারে না!" দেবু কথা বলতে পারল না। রিজিয়া দেখলেন চোখটা আবার জলজল করে উঠল ওর। রিজিয়া বললেন, "আর দাঁড়িয়ে থাকিস না। চল এবার। বাবার সঙ্গে দেখা করবি।" দেবুকে দেখে নমিতা বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। রিজিয়া গিয়ে দাঁড়ালেন মুকুলের বিছানার পাশে। বললেন, " দেখো

www.MotherSathe.Com

কে এসেছে?" মুকুল কোনওমতে ঘাড় ফেরালেন, তারপর বিকৃত মুখ করে বললেন, "জানোয়ার।" "কী বলছ কি তুমি?" রিজিয়া বললেন, "এখনও এসব করছ? এখনও?" মুকুল বললেন, "কেন? সত্যি বলা অন্যায়? বিয়ের দশ মাসে দেবু হয়নি? আমি না বললেই সব মিথ্যে হয়ে যাবে? ওর চোখ অমন কটা কেন? সাহেবের চোখ অমন ছিল বলেই তো, নাকি? কী? কথা বলছ না কেন? আমার বয়স হয়েছে তো কী হয়েছে? আমি ভুলে গেছি নাকি সব? কেমন দেখতে ছিল, বলো কেমন দেখতে ছিল সেই সাহেবকে? কলকাতায় থাকতাম আমি। তাই দেখতে পাইনি। কিন্তু সরমা বলেছে আমায়। তোমার প্রেমিক ছিল ওই সাহেব। কেমন দেখতে ছিল তাকে? ওর মতো কটা চোখ ছিল? কী হল বলো, আজ ছেলের সামনে বলো তুমি। নাহলে..." অসুস্থ মানুষটা আচমকা কেমন যেন থমকে গেলেন। যেন শেষ কথাটা আটকে গেল গলার কাছে। ওঁর দৃষ্টি ধরে দরজার দিকে তাকালেন রিজিয়া। দেখলেন নীপা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার পিছনে পূরব! মুকুল বড় বড় চোখ করে পুরবকে দেখলেন। পূরবও নীপা আর দেবুকে সরিয়ে এসে দাঁড়াল রিজিয়ার পাশে। "এ কে? কে এটা?" মুকুল বালি-কাগজের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি করে সবার সামনে আজ বলো তো রিজিয়া। সবাই জানুক, আসল সত্যিটা কী!" রিজিয়া তাকালেন পূরবের দিকে। বাদামি চুল, কটা চোখ। হালকা গোলাপি গায়ের রং। কে বলবে বাঙালির ছেলে! "কী হল, বলো," মুকুলের মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল, "সবার সামনে আজ স্বীকার করো তোমার চরিত্র দোষ। কীভাবে এমন চেহারা হয় এদের? বলো সেই জানোয়ারটা কেমন দেখতে ছিল। বলো।" রিজিয়া চোয়াল শক্ত করলেন। তারপর পূরবকে টেনে কাছে আনলেন নিজের। মুকুলের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "এই তো, এমনই ছিল দেখতে। এমন কটা চোখ, বাদামি চুল, গায়ের রং—সব এক। হুবহু এক। নাতির মধ্যে দিয়ে তিনিই তো আবার ফিরে এলেন আজ আমার কাছে। সারা জীবন আমায় যতই যন্ত্রণা দাও না কেন, মনে রেখো তুমি তাকে আমার মন থেকে সরাতে পারোনি। মনে রেখো, তুমি যেমন আমার যন্ত্রণায় থাকো, তেমনই সে থাকে আমার ভালবাসায়। সমস্ত কিছুর মধ্যে আজও সে আমার। অ্যান্ড নো বডি ক্যান চেঞ্জ দ্যাট।" ঘ মেঘ ফাটা জ্যোত্স্নায় আজ ভেসে যাচ্ছে চরাচর। ধলেশ্বরীর জলে কে যেন ছিটিয়ে দিয়ে গেছে হিরের গুঁড়ো। প্রকাণ্ড গাছেরা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাচ্ছে শুধু। আজ পাগল হাওয়ার দিন। পাগল হওয়ার দিনও হয়তো আজই! রাতের এই পথ ধরে যেতে যেতে এটাই মনে হল রিজিয়ার। দূরে ছোট্ট বাগান-ঘেরা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। আরও দূরে দেখা যাচ্ছে গাঢ় সিংহের মতো জমিদার বাড়ি। রিজিয়া এগিয়ে চলেছে। পিছনের সমস্ত বাধা কাটিয়ে এসেছে ও। ঘুমন্ত বাবা, মা আর দাদার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে এদের চেনে না। মনে হয়েছে এদের জন্য চোখের জল ফেলার অর্থ নেই কোনও। রজারের মুখটা মনে পড়ছে ওর। বাবার ছুঁড়ে মারা খড়মে কেটে যাওয়া কপালটা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে শাবল নিয়ে তেড়ে যাওয়া দাদার মুখটা। ওরা তো মেরেই ফেলত রজারকে। দাদা তো মাথা লক্ষ্য করে চালিয়েছিল শাবলটা। রজার কোনওমতে মাথা সরিয়ে নিয়ে বেঁচেছিল! মা গিয়ে না থামালে যে কী হত! বাবা বলছিল, "এত বড় সাহস? কুলীনের মেয়েকে বিয়ে করবে তুমি। জানোয়ার পেয়েছ আমাদের? তোমাদের রাজত্ব বলে যা খুশি তাই করবে!" দাদা গালি দিয়েছিল খুব। মুখে আনা যায় না এমন ভাষায় রজারের বাপ মা তুলে কথা বলেছিল। সাইকেলটা তুলে আছড়ে, লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছিল স্পোক। রজারকে কেউ কোনও কথা বলার সুযোগ দেয়নি! আশেপাশে লোক জমে গিয়েছিল। কেউ হাসছিল। কেউ এই সুযোগে

www.MotherBathe.Com

ঢিল ছুঁড়ে মারছিল রজারকে। কেউ আবার বলছিল কীভাবে রজার রোজ স্কুল থেকে ফেরার পথে বিরক্ত করত রিজিয়াকে! বারান্দায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিল রিজিয়া। কথা বলতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল শরীরের সব রক্ত বোধহয় বেরিয়েই যাবে এবার। লোক বাড়ছিল ক্রমশ। কেউ বলছিল রাম দা দিয়ে কেটে কাছের শিয়াল মাটির চোরাবালিতে পুঁতে দিলেই তো হয়। কেউ আবার পুড়িয়ে মারার কথাও বলছিল। সবার মাঝে রক্তাক্ত রজার দাঁড়িয়েছিল একা। আর বলছিল, "আঙ্কল রিজিয়া। প্লিজ, ফর ওয়ান্স। ও বললেই আমি চলে যাব।" দাদা আর নিতে পারেনি শেষটায়। হাতের শাবলটা বর্ষার মতো করে ছুঁড়ে মেরেছিল রজারের দিকে। রজার সরতে কি দেরি করেছিল সামান্য? ঠিক মনে নেই ওর। কারণ ততক্ষণে মাটির বারান্দায় মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল রিজিয়া! কথা ছড়িয়েছিল দ্রুত। ছিছিক্কারও। পুঁটি আসা বন্ধ করে দিয়েছিল ওর কাছে। স্কুল যাওয়ার কথা মুখেও আনতে পারেনি আর। এর দু'দিনের মাথায় একটা পাল্কি এসে থেমেছিল ওদের বাড়ির সামনে। বার্নিশ করা, রুপোর ফলক লাগানো পাল্কি। ওদের সোঙ্গারের সবাই এই পাল্কি চিনত। জমিদার গিন্নি এটাই করেই ঘোরেন যে! "প্রভা, কী শুনছি আমি?" গিন্নিমা এসে দাঁড়িয়েছিলেন বারান্দায়। মা হতবাকের মতো তাকিয়েছিল প্রথমটায়। তারপর উপুড় হয়ে গিন্নিমার পা জড়িয়ে কেঁদেছিল খুব। গিন্নিমা বলেছিলেন, "এটা হল কী করে? মেয়েকে ধরে রাখতে পারিসনি? অমন রূপ দেখে তো যে কোনও মানুষের মাথা ঘুরবে। আর ওই লালমুখোগুলো তো তক্কে তক্কে থাকেই। কত করে বলেছিলাম ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দে, শুনিসনি কেন?" মা কান্না মিশিয়ে বলেছিল, "বুঝতে পারিনি মা। আমার মেয়ে সাত চড়ে রা করে না। মাথা নিচু করে যেত আসত। আর শয়তানটা... একেবারে বাড়িতে এসে.... ওদের জাতের ঠিক আছে? আচার বিচারের ঠিক আছে? কত বড় সর্বনাশ যে হল আমার!" গিন্নিমা গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, "সর্বনাশ মানে? আর কী হয়েছে?" "না মা আর তো কিছু হয়নি। আমার ছেলে এমন শাবল পেটা করেছে যে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালিয়েছে শয়তানটা। আর ওই রাক্ষসটাকে দেখে ভয়ে আমার মেয়ে তো মুচ্ছো গিয়েছিল একদম।" "ঠিক আছে, শোন, আর দেরি করা ঠিক হবে না বুঝলি?" গিন্নিমা চোয়াল শক্ত করে তাকিয়েছিলেন। মা বুঝতে পারেনি। অবাক হয়ে দেখেছিল গিন্নিমাকে। গিন্নিমা বলেছিলেন, "আমার ছেলে মুকুল। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ছে। ওর সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দেব সাত দিনের মধ্যে। রিজিয়াকে তো আমি মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিলাম ওর জন্য। বিয়ের পর ব্যান্ডেলে আমাদের নতুন বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। ওখানেই থাকবে ওরা। জানিস তো আমরা ব্রাহ্মণ। তোদের আপত্তি নেই তো?" মা কিছু বলতে পারছিল না। বোবায় ধরা মানুষের মতো তাকিয়েছিল শুধু। বুঝতে পারছিল না এতে খুশি হবে না ভয়ে, কৃতজ্ঞতায় আরও নত হয়ে থাকবে! ঘরের ভিতরে বসে মাথা নিচু করে সব শুনছিল রিজিয়া। আর বুঝতে পারছিল একটা একটা করে ওর সব বন্ধন কেটে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে! তাই আজ, এই মধ্য রাতে পিছনে বেড়ার দরজা দিয়ে রিজিয়া বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। পরশু ওর বিয়ে। কিন্তু ও তো সেখানে থাকতে পারবে না। কোনও জমিদারের ছেলের জন্য তো ঈশ্বর ওকে পাঠাননি! ও তো সম্পূর্ণ রজারের! কাঠের বারান্দায় বেহালা নিয়ে বসেছিল রজার। রিজিয়া গিয়ে দাঁড়াল ওর সামনে। "তুমি?" রজার সোজা হয়ে বসল। রিজিয়া দেখল বাঁ পায়ে ব্যান্ডেজ করা। বুঝল দাদার তৈরি করা ক্ষত! ও বলল, "আমি চলে এসেছি তোমার কাছে। পালিয়ে যাই চলো।" রজার তাকাল ওর দিকে। জ্যোত্স্না এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে রিজিয়ার মুখে। রজার তাকিয়ে দেখছে ঈশ্বরীর রূপ। "কী

www.MotherSathe.com

হল, চলো।” রজার হাসল, বিষণ্ণ গলায় বলল, “না রিজিয়া। আমি চোর নই। তোমার ভালবাসা পেয়েছি। কিন্তু তার জন্য এটা করতে পারব না। আমি ভুলে গিয়েছিলাম তোমাদের সমাজ। তুমি চলে গেলে তোমার বাবা মায়ের কী হবে ভাবতে পারো?” রিজিয়ার জল আসছিল চোখে। এ কী বলছে রজার? এমন করে বলছে? ও বলেছিল, “আমায় ভালবাস না তুমি?” “তোমায় ছাড়া কি আর কাউকে ভালবাসা যায় কোনওদিন? আমি কি কোনওদিন তা পারব ভেবেছ? কিন্তু তাই বলে আমি তো আর অন্যায় করতে পারি না। তুমি ফিরে যাও। আমিও চলে যাব এখান থেকে।” “ফিরে যাব?” “রাত গভীর, কেউ জানবে না। তোমার মা বাবার কথা ভাব। তুমি এমন করলে ওদের গ্রামের লোকেরা ছিঁড়ে খাবে।” রজার মাথায় হাত দিয়েছিল রিজিয়ার। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি ও। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রজারের বুকে। দু’হাত দিয়ে পিষে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাইছিল রজারের সঙ্গে। মনে হচ্ছিল এই তো শেষ সুযোগ। যতটা পারা যায় নিজের শ্বাসের মধ্যে ভরে নিতে হবে এই মানুষটাকে! ও বলেছিল, “ঠিক আছে। কিন্তু তার আগে আমায় তুমি নাও। তোমার সবটুকু একবারের জন্য হলেও আমায় দিয়ে যাও। আমার মধ্যে তোমায় রেখে দেব সারা জীবন।” রজার তাকিয়েছিল রিজিয়ার দিকে। তারপর অস্ফুটে বলেছিল, “দেব তো। তোমাকেই তো সব দিয়ে যাব আমার।” এই নিঝুম রাত, এই ধলেশ্বরীর ঢেউ আর চরাচর জুড়ে ফুটে থাকা প্রকাণ্ড চাঁদ, শুধু দূরে থেকে দেখেছিল কৃত্রিম বিধি নিষেধের মাথা ছাড়িয়ে একে অপরকে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওঁরা। কীভাবে পূর্ণতা পাচ্ছে এই প্রেম! ৫ এখন অনেক রাত। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। দোতলার জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় আজ ভেসে যাচ্ছে এই ঘর। এক কোণে টেবল ল্যাম্পের নরম আলোর বৃত্তে বসে টিনের বাক্সটা কাছে টানলেন রিজিয়া। কতদিন কেটে গেছে। বাক্সের ওপরে নানা রঙে অাঁকা উজ্জ্বল ছবি ছিল একটা। ব্রিটিশ কোম্পানির বাক্স। রজার দিয়েছিল! রিজিয়া হাত বোলালেন বাক্সটার ওপর। জঙে হারিয়ে গেছে ছবি। তবু কি সত্যি হারিয়ে যায়! সেই রাত, সেই ধলেশ্বরীর পাড় আর সোনার গোলকের মতো চাঁদের তলায় দাঁড়িয়ে রিজিয়া সবটা দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন রজারকে। ওঁর চওড়া বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে অাঁকড়ে ধরেছিলেন শরীরটা। মুখ উঁচু করে ঠোঁট খুঁজে নিয়েছিলেন নিজের ঠোঁটে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলেন, “ঘরে চলো।” ঘরে গিয়েছিলেন রজার। রিজিয়া নিজেই উদ্যোগী হয়ে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন নিজেকে। কিন্তু রজার বাধা দিয়েছিলেন এবার। বলেছিলেন, “আমি পেয়ে গেছি তোমায় রিজিয়া। সবটাই তো আমায় দিয়ে দিলে তুমি। এটা না হলেও আর ক্ষতি নেই।” বিহ্বল হয়ে রজারকে দেখেছিলেন রিজিয়া। বলেছিলেন, “আমায় তুমি চাও না!” “একমাত্র তোমাকেই তো চেয়েছি। তাই তো সব ভুলে তোমার বাবার কাছে গিয়েছিলাম। কোনও কিছুকেই ভয় পাইনি। পাত্তা দিইনি। তারপর আজ এই তুমি এলে। আমি পূর্ণ হলাম। কে আর এত পায়, বলো?” রিজিয়ার চোখে জল এসে গিয়েছিল। বলেছিলেন, “তুমি যে বললে দেবে, সেটা মিথ্যে?” “না তো,” বলে রজার এগিয়ে গিয়েছিলেন ঘরের এক কোণে। একটা বাক্স নিয়ে এসে বলেছিলেন, “এটা দেব তো তোমায়। জানি তোমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। জানি তোমার নতুন জীবন শুরু হবে। তার মধ্যে কোথাও যদি আমার এটাকে একটু রাখো... না কেঁদে, হাসি মুখে যদি একটু রাখো...” “কী আছে এতে?” রিজিয়া বাক্সটা নিয়ে তাকিয়েছিল রজারের দিকে। “আমি আছি রিজিয়া। আমার ছোটবেলার রং-পেন্সিল। কাচের গুলি। মায়ের দেওয়া সোনার আংটি, তোমার ছবি আর একটা টিনের পুতুল।” “টিনের পুতুল!” আজ বহু বছর পরে আবার বাক্সটা খুললেন রিজিয়া।

www.MotersSathe.Com

বাক্সের ভিতর থেকে হলদেটে হয়ে যাওয়া নিজের ছবিটা এবার তুলে নিলেন হাতে। রজারের তোলা সেই ছবি... সামান্য বিরক্ত মুখে তাকিয়ে আছেন রিজিয়া! দিন কত পালটে যায়! মানুষ হারিয়ে যায় সময়ের ভাঁজে। আজও মনে আছে সেই রাতে বাড়ি ফিরে রিজিয়া দেখেছিলেন মা বসে আছেন ঘরে। দেখেছিলেন পাশে রাখা কাটারি। ওকে দেখেই মা কাটারি তুলে বলেছিল, "আজ তোর শেষ দিন। সাহেবের থেকে নোংরা হয়ে এসেছিস!" রিজিয়া কিছুই বলেননি। শুধু বাক্সটা বুকে চেপে তাকিয়েছিলেন মায়ের দিকে। তেড়ে আসা মাকে বাবা আটকেছিল। তারপর রিজিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আমায় সত্যি করে বল, আমার শালগ্রাম ছুঁয়ে বল মা, তুই কি এখনও নতুন আছিস? সাহেব তোকে..." রিজিয়া বাবার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠে বলেছিলেন, "সে আমায় কিছুই করেনি বাবা। সে কিছু করার মতো মানুষ নয় যে!" ফুলশয্যার রাতে মুকুলকে প্রথম ভাল করে দেখেছিলেন রিজিয়া। কেমন অদ্ভুত মানুষ। রাগের গলায় মুকুল বলেছিলেন, "সরমা বলছিল তোমায় নাকি কোন একটা সাহেব বিয়ে করতে চেয়েছিল? সে আর কিছু করেছে নাকি?" উত্তর না দিয়ে চোয়াল শক্ত করে বসেছিলেন রিজিয়া। মুকুল এসে ধাক্কা মেরে শুইয়ে দিয়েছিলেন রিজিয়াকে। গায়ের কাপড় টেনে ছাড়াতে ছাড়াতে বলেছিলেন, "ও, উত্তর দিবি না? দিবি না উত্তর! ঠিক আছে, আমি নিজেই দেখছি তবে। দেখছি তুই এঁটো কি না!" মুকুলের শক্ত শরীরের তলায় চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন রিজিয়া। মুকুল পাগলের মতো অ্যাঁচড়াচ্ছিল ওঁকে। আর জিজ্ঞেস করছিল, "বল কেমন দেখতে ছিল সেই সাহেব? বল হারামজাদি, বল!" মুকুলের মুখ থেকে আসা সিগারেটের গন্ধে শরীর গুলিয়ে উঠছিল রিজিয়ার। যন্ত্রণা হচ্ছিল। আর ঠিক তখনই রিজিয়া দেখেছিলেন তাঁকে। দেখেছিলেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন রজার। হাসছেন। রিজিয়ার শরীর নরম হয়ে এসেছিল। দু'হাত বাড়িয়ে রজারকে ধরেছিলেন তিনি। মুকুলকে মুছে ফেলে রজারের সঙ্গেই সেই রাতে এক হয়ে গিয়েছিলেন রিজিয়া! সাদা কালো ছবিটা রেখে বাক্সটা আবার দেখলেন রিজিয়া। জং-ধরা টিনের পুতুলটা শুয়ে আছে এক পাশে। ছোট্ট ছেলে পুতুল। রজার বলেছিলেন, "আমার মা পুতুল বানাত। আমার মতো দেখতে এই পুতুলটা বানিয়ে দিয়েছিল মা। মারা যাওয়ার আগে বলেছিল চিরদিন এটা সঙ্গে রাখতে। এটা তুমি রাখো রিজিয়া। আমায় তুমি রাখো তোমার সঙ্গে।" সারা জীবন মুকুল অত্যাচার করে গেছেন ওঁর ওপর। শুধু জানতে চেয়েছেন কেমন দেখতে ছিল সেই সাহেব, কেন দেবুর চোখের রং কটা! কেন পূরবকে অমন দেখতে? কার থেকে পেয়েছে ওরা এমন চেহারা? আজ সব অত্যাচার ফিরিয়ে দিয়েছেন রিজিয়া। পূরবকে দেখিয়ে বলেছেন ঠিক এরকম দেখতে ছিল রজার। বলেছেন পূরবের মধ্যেই আবার ফিরে এসেছেন সেই সাহেব! মুকুল চুপ করে গেছেন একদম। কেমন যেন গুটিয়ে গেছেন তারপর থেকে। খারাপ কথা, গালিগালাজ বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে। জীবনের শেষে এসে এভাবে নিজের আশঙ্কা সত্যি হয়ে উঠবে ভাবেননি। ভাবেননি এভাবেও পরাজয় ঘটতে পারে! টিনের পুতুলটা হাতে তুললেন রিজিয়া। জঙের ভিতর দিয়ে আবছা কালো চুল আর চোখের মণির কালো রং দেখা যাচ্ছে। রজারের চুল আর চোখের মণি এমনই কুচকুচে কালো ছিল। না, দেবুর সঙ্গে বা পূরবের সঙ্গে তাঁর মিল নেই। রিজিয়া জানেন থাকতেও পারে না মিল। রজারের মতো কেউ হতেই পারে না! পুতুলটা বুকের কাছে চেপে ধরলেন রিজিয়া। তারপর আলতো হাতে নিভিয়ে দিলেন টেবল ল্যাম্প। জ্যোত্স্নার রাত্রি সময় বেয়ে ফিরে চলল উজানে। যেখানে ধলেশ্বরীর জলে আজও ভেসে বেড়াচ্ছে হিরের গুঁড়ো। আর দশকের পর দশক পার করে সবার

www.MotherSathe.Com

মাথার ওপর থেকে প্রকাণ্ড এক চাঁদ শুধু তাকিয়ে দেখছে সেই নবীন কিশোরীটিকে। দেখছে তার হাতে ধরা টিনের পুতুল!

**********||||||